بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ১২ ডিসেম্বর, ২০২৫ মোতাবেক ১২ ফাতাহ, ১৪০৪ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦۖ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ (সূরা আন-নাহল: ১২৬)

এর অনুবাদ হলো– তুমি প্রজ্ঞা ও সদুপদেশের মাধ্যমে তোমার প্রতিপালক-প্রভুর পথের দিকে আহ্বান জানাও। আর তাদের সাথে এমন যুক্তিপ্রমাণের আলোকে বিতর্ক করো যা সর্বোত্তম। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক-প্রভুই তাদেরকে সবচেয়ে ভালো জানেন যারা তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। আর তিনি হিদায়াতপ্রাপ্তদেরও সবচেয়ে ভালো জানেন।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে এবং অন্যান্য অনেক আয়াতেও, যেখানে তবলীগ করার (জন্য) নির্দেশ দিয়েছেন, সেখানে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে তবলীগ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সদুপদেশ দেবার নির্দেশ প্রদান করেছেন, যেন লোকদের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং তাদের উপকার হয়। আর যারা এর ওপর আমল করেন, তাদের তবলীগ সদা ফলপ্রসূ হয়, কার্যকর প্রমাণিত হয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা অনেকাংশে সফলতা লাভ করেন। অতএব, সর্বদা এই নীতি দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কারণে লোকেরা মনে করে, তবলীগ (করা) অনেক সহজ। যারা (তবলীগের) আগ্রহ রাখে তারা গভীর আগ্রহের সাথে একাজ করার চেষ্টা করে। অনেকেই আছে যারা উন্মুক্ত স্থানে গিয়ে তবলীগ করে। এসব দেশে অনুমতি আছে। পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে তো অনুমতিই নেই, এমনিতেও তবলীগ নিষিদ্ধ। কাজেই যারা তবলীগ করার আগ্রহ রাখে, তারা সেখানে গিয়ে শখ পূর্ণ করে। এটি ভালো উদ্যোগ, কিন্তু তবলীগের জন্যও কিছু শর্ত এবং নিয়মকানুন রয়েছে, যেগুলো সর্বদা দৃষ্টিগোচরে রাখা উচিত, নতুবা উল্টো প্রভাব পড়ে। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা এ আয়াতেও উল্লেখ করেছেন। অতএব, এ বিষয়টি অনুধাবন করুন, এরপর তবলীগ করুন। কেননা অনেকে তবলীগ করতে গিয়ে লোকদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে আর ইতিবাচক প্রভাব পড়ার পরিবর্তে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। আবার অনেক সময় জামা'তের ওপর এবং জামা'তের শিক্ষামালার প্রতি অআহমদীরা আপত্তি করার সুযোগ পায়, যা প্রকৃত সত্য ও বাস্তবতা পরিপন্থি। এছাড়া অনেকে নতুন নতুন এক্ষেত্রে যোগ দেয় এবং মনে করে, আমাদের কাছে খুব অকাট্য দলিল-প্রমাণ আছে; কিন্তু যখন দলিল-প্রমাণ (খুঁজে) পায় না বা বিরোধীদের বশ করতে পারে না, অথবা অকাট্য দলিল দিতে পারে না, তখন নৈরাশ্যের শিকার হয়ে যায়। অথচ নিরাশ হবার কিছু নেই। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমাদের কাছে দলিল-প্রমাণ আছে। তবে কেউ যদি তা বুঝতে না পারে বা বর্ণনা করতে না পারে– সেটি ভিন্ন কথা। আহমদীয়া জামা'ত যে কথা বলে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তা প্রজ্ঞা ও দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে বলে এবং সেই শিক্ষার আলোকে বলে থাকে যা আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে পবিত্র কুরআনে প্রদান করেছেন এবং যার ওপর মহানবী (সা.) স্বয়ং আমল করেছেন। কাজেই, সর্বদা এ বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখা উচিত যে, আমাদের সর্বোত্তম

পদ্ধতিতে তবলীগ করতে হবে। একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে, অর্থাৎ তবলীগের বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি (আ.) বলেন,

আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, আমেরিকা ও ইউরোপে ইসলামের শিক্ষা প্রচারের জন্য কী করা উচিত? এটি কি যুক্তিযুক্ত হবে যে, মুসলমানদের মধ্য হতে কতিপয় ইংরেজী জানা মুসলমান ইউরোপ ও আমেরিকায় গিয়ে বক্তৃতা ও ভাষণের মাধ্যমে ইসলামের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করবে? [যেহেতু ভাষা জানে, তাই তবলীগ করবে?] তিনি বলেন, **কিন্তু আমি ঢালাওভাবে কখনো এর উত্তরে 'হ্যাঁ' বলব না।** [এটি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ একটি বিষয়।] যেমনটি তিনি (আ.) বলেন, **ইংরেজী জানা অথবা অন্য কোনো ভাষা জানা থাকলেই ধর্মের জ্ঞান অর্জন হয়ে যায় না। বরং এর আরো অনেক অপরিহার্য দিক রয়েছে।** যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, এর জন্য জ্ঞান বৃদ্ধি করাও আবশ্যক। এখানেও বিভিন্ন জায়গায় মানুষ তবলীগ করে, কিন্তু বিরোধীদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর, পুরো জ্ঞানভিত্তিক উত্তর দিতে পারে না। একইভাবে যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও একই অবস্থা।

অতএব, প্রথমে সকল দাঈ ইলাল্লাহ্ এবং যারা তবলীগের আগ্রহ রাখেন, তাদের উচিত নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি করা। সকল আপত্তি একত্রিত করুন। সাধারণত জামা'তের বইপুস্তকে এগুলোর উত্তর রয়েছে, আর যদি না থাকে তাহলে দেশীয় পর্যায়ে তবলীগের যে টিম গঠিত আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করুন, তাদের সাহায্য নিন আর এসব টিমেও যারা জ্ঞান রাখেন, তাদের সাহায্য নিন। যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **আমি তো কখনো (ঢালাওভাবে) হ্যাঁ-সূচক উত্তর দেবো না।** এরপর তিনি (আ.) বলেন, **আমি কখনোই এটি যথার্থ জ্ঞান করি না যে, এমন মানুষ যারা ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত নয় এবং এর সুমহান বৈশিষ্টাবলি সম্পর্কে একেবারেই অনবহিত, অধিকন্তু অধুনা কালের সমালোচনাগুলোর খণ্ডনের পুরো বুৎপত্তি রাখে না আর রূহুল কুদুস বা ফেরেশতার সাহায্যে শিক্ষাপ্রাপ্তও নয়, সে আমাদের পক্ষ থেকে মুখপাত্র হিসেবে যাবে। এমনটি হতে পারে না।** [মুবাল্লিগ ও তবলীগকারীর জন্য ফেরেশতার সাহায্যে জ্ঞান অর্জন করাও এবং আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক থাকাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।] তিনি (আ.) বলেন, **আমার মুবাল্লিগদেরও আল্লাহ্ তা'লার সাথে এক বিশেষ সম্পর্ক থাকা উচিত, যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাহায্য করেন।** তিনি (আ.) বলেন, **আমার মতে, এমন কাজের উপকারিতার চেয়ে অপকারিতা বেশি আর তা দ্রুত প্রকাশ পায়; তবে ব্যতিক্রম থাকতে পারে।** অর্থাৎ, আমরা এমন কথা বললে এর কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণ বেশি হবে, (তবে) আল্লাহ্ চাইলে ব্যতিক্রমও হতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে লাভজনকও হয়ে থাকে, (এমন) দু-একটি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কিন্তু সাধারণত নেতিবাচক প্রভাবই পড়ে। অতএব, একজন মুবাল্লিগ এবং দাঈ ইলাল্লাহ্কে সর্বদা এ বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখা উচিত– তবলীগের অনেক আবশ্যকীয় দাবি বা শর্তও রয়েছে, যা আমাদের পূর্ণ করতে হবে। এমনটি হলেই আমরা সত্যিকার অর্থে তবলীগ করতে পারব।

তবলীগের ক্ষেত্রে প্রথম যে বিষয়টি আমাদের মনে রাখতে হবে তা হলো, ইসলাম একমাত্র ধর্ম এবং মহানবী (সা.) একমাত্র নবী, যিনি পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'লার সেই বাণী নিয়ে এসেছেন যা সমগ্র বিশ্বের জন্য প্রযোজ্য। আর আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে (সা.) সমগ্র মানবজাতি, গোটা বিশ্ব এবং সকল জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত ইতিহাস (পর্যালোচনা করে)

দেখুন! মুসলমানদের সংখ্যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশের চেয়েও কম। এর কারণ কী? এর কারণ হলো, প্রজ্ঞার সাথে তবলীগ করা হয় নি আর সেই বাণী যথাযথভাবে প্রচার করা হয় নি। মুসলমানরা মনে করে, আমরা জিহাদের মাধ্যমে ইসলামের বাণী প্রচার করব। অথচ কেবল শত্রুর আক্রমণের ক্ষেত্রেই জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মুসলমানরা জিহাদের এবং তরবারি ধারণ করার অনুমতি কেবল তখনই লাভ করেছিল যখন কাফিররা কিংবা অমুসলিমরা ইসলামের ওপর আক্রমণ করে একে নির্মূল করতে চেয়েছিল। তখন আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের সূরা হজ্জে বলেন,

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (সূরা হজ্জ: ৪০)

অর্থাৎ, সেসব লোক যাদের বিরুদ্ধে বিনা কারণে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরকেও যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হলো, কারণ তাদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করতে সক্ষম। এটাই বড়ো কথা। আর ইতিহাস দেখেছে, ইতিহাস সাক্ষী যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাহায্য করেছেন এবং তাঁর সর্বশক্তিমান হওয়া প্রমাণ করেছেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা যখন যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছিলেন, তখন একারণেই দিয়েছিলেন যে, অত্যাচার হচ্ছিল। কিন্তু বর্তমান যুগ এ ধরনের জিহাদের যুগ নয়। এখন ধর্মের খাতিরে কোনো যুদ্ধ হচ্ছে না; যদিও বিভিন্ন অজুহাতে মুসলমানদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে, কিন্তু (প্রতিপক্ষ কর্তৃক) ধর্মের নাম নেওয়া হচ্ছে না। আল্লাহ্ তা'লাও এবং মহানবী (সা.)-ও পবিত্র কুরআনের জিহাদকেই 'জিহাদে আকবর' বা সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

অতএব এ হচ্ছে মুসলমানদের সাধারণ অবস্থা, যার কারণে আজও মুসলমানরা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশেরও কম। আমাদের এই বিষয়টি সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা উচিত এবং নিজেদের দায়িত্ব অনুধাবন করা উচিত যে, আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছি এবং তাঁর সাথে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছি, আমাদের এই বিষয়ের ওপর আমল করতে হবে, অর্থাৎ আমাদের আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে, তাঁর প্রদত্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে এবং এর ওপর আমল করে বিশ্ববাসীর কাছেও এই বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। কিছু লোক সৎ উদ্দেশ্যে কাজ করে, যেমনটি আমি শুরুতে বলেছি; কিন্তু তাদের পূর্ণ জ্ঞান থাকে না অথবা আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্কের সেই মান থাকে না যা একজন দাঈ ইলাল্লাহ্ (তথা আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারী)-র হওয়া উচিত। যার ফলে পরবর্তীতে তারা হতাশ হয়ে পড়ে। এই কথাটি সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, মহানবী (সা.)-ও তবলীগের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেছেন। হাদীসে অনেক রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত রয়েছে, আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন আমরা মানুষের সাথে তাদের বুদ্ধিমত্তা বা মেধা অনুযায়ী কথা বলি। প্রথম কথা এটাই যে, যার যতটুকু বুদ্ধি বা জ্ঞান, অথবা সে যে মেজাজ বা ধর্মের অনুসারী, তার সাথে সে অনুযায়ী কথা বলা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, মুসলমানদেরকে যদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমন সম্পর্কে জানাতে হয়, তবে তাদের কুরআন, হাদীস এবং তাদের জ্যেষ্ঠদের কিতাব থেকে জানানো উচিত। তবলীগকারীদের তিনি (সা.) একথাও বলেছেন, [এটি একটি দীর্ঘ হাদীস, যার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো]–অত্যাচারিত ব্যক্তির বদদোয়া বা অভিশাপ থেকে আত্মরক্ষা করো। তবলীগকারীদের জন্য এটিও অত্যন্ত জরুরি। তার নিজের চরিত্র সবসময় উত্তম ও উন্নত হতে হবে এবং 'হুকুকুল ইবাদ' (বা বান্দার প্রাপ্য) প্রদানের সেই মান থাকতে হবে। অর্থাৎ সে যেন কখনও

কোনো অত্যাচারিত ব্যক্তির অভিশাপকে আমন্ত্রণ না জানায়, বরং সর্বদা অত্যাচারিতের দোয়া পায়। যদি সে দোয়া লাভকারী হয়, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তার কাজে বরকত দান করবেন। তিনি বলেন, মযলুমের অভিশাপকে ভয় করা উচিত, কেননা তার ও আল্লাহ্র মাঝে কোনো পর্দা বা আড়াল নেই।

সুতরাং সর্বদা এই বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। আমি যে আয়াতটি পাঠ করেছি, তাতে ٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ (উত্তম উপদেশ)-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

মিথ্যা অভিযোগগুলো প্রজ্ঞা ও ٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ-র সাথে দূর করা আল্লাহ্ আমাদের জন্য আবশ্যক করেছেন। আর আল্লাহ্ জানেন, উত্তর দেবার সময় আমরা কখনোই নম্রতা ও ধীরস্থির আচরণ পরিত্যাগ করি নি। অর্থাৎ সর্বদা নম্রতার ভিত্তিতে কাজ করেছি। তিনি নিজের অবস্থা সম্পর্কে বলেন যে, আমি তো নম্রতা ও ধীরস্থিরতার সাথে উত্তর দিই। আল্লাহ্ তা'লা সাক্ষী, এটাই সর্বদা আমার নীতি। সর্বদা নরম ও কোমল শব্দ ব্যবহার করেছি।

সুতরাং, তবলীগের এই পদ্ধতিই আমাদের অবলম্বন করা উচিত। তাই যারা তবলীগ করতে গিয়ে কখনো কখনো রাগের বশবর্তী হয়ে বিরোধীদের মতো ভাষা ব্যবহার করতে শুরু করে, তাদের মনে রাখা উচিত যে, আমাদের তবলীগ যেন নৈতিকতার গণ্ডির মধ্যেই থাকে। তাদের (বিরোধীদের) কাছে কোনো দলিল বা যুক্তি নেই, তাই তারা খারাপ ভাষা ব্যবহার করে। কিন্তু যদি আমরাও খারাপ ভাষা ব্যবহার করি, তবে এর অর্থ হবে– আমাদের কাছেও কোনো দলিল-প্রমাণ নেই। কেউ কেউ বলে থাকেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও কঠোরতা প্রদর্শন করেছেন। প্রথম কথা তো সেটাই যা আমি বর্ণনা করেছি যে, তিনি কঠোরতা করেন নি। আর যেখানে তিনি কঠোরতা করেছেন, সেখানে তিনি লোকদের এই উত্তর দিয়েছেন যে, **একমাত্র ব্যতিক্রম হলো, কখনও কখনও বিরোধীদের পক্ষ থেকে অত্যন্ত কঠোর ও নৈরাজ্যকর লেখা পেয়ে নীতিগত কারণে কিছুটা যৌক্তিক কঠোরতা আমরা এই উদ্দেশ্যে অবলম্বন করেছি, যেন জাতি এভাবে তাদের পক্ষে প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে দেখে নিজেদের বুনো উত্তেজনা দমন করে।** [এক্ষেত্রেও তাঁর সদুদ্দেশ্যই ছিল।] **আর এই কঠোরতা কোনো প্রবৃত্তির তাড়নায় বা উত্তেজনার বশে ছিল না, বরং নিছক وَجَادِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ–এই আয়াতের ওপর আমল করে একটি কৌশল হিসেবে তা ব্যবহার করা হয়েছে।** অর্থাৎ, এই যে কঠোরতা আমি করেছি, তা অন্তরের কোনো ক্ষোভ থেকে উৎসারিত ছিল না। এটি ছিল একটি শিক্ষা দেবার জন্য। আর দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের মধ্যে যারা উত্তেজিত হয়ে পড়ে, তাদের উত্তেজনা দমানোর জন্য। অর্থাৎ আমি যদি উত্তর দিয়ে দিই, তবে সাধারণ মানুষ বা মুসলমানরা কোনো ভুল পদক্ষেপ নেবে না এবং মারামারিতে লিপ্ত হবে না। তিনি বলেন, আর সেটিও তখন করা হয়েছে যখন বিরোধীদের অপমান, তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও গালিগালাজ চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। আমার যেসব লেখায় কঠোর শব্দ দেখা যায়, তা সেই সময় তাদের বিরোধিতার কারণে ও তাদের গালিগালাজের কারণে করা হয়েছে। কেন করেছেন? যখন ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাদের অপমান, উপহাস ও গালিগালাজ চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল, যখন তারা তা চরম পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল, তখন করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের নেতা ও মনীব, বিশ্বজাহানের সরদার, সৃষ্টিকূলের গৌরব (সা.)-এর নামে ওই লোকেরা এমন নোংরা ও দুষ্কৃতিমূলক শব্দ তারা ব্যবহার করেছে যে, এর ফলে শান্তিশৃঙ্খলা হারিয়ে যাবার আশঙ্কা ছিল। তাই সেই সময় আমরা এই কৌশল অবলম্বন করেছি।

সুতরাং তিনি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে কঠোর শব্দ ব্যবহার করা থেকে জামা'তকে বারণ করেছেন এবং এটাই বলেছেন যে, কিছু জায়গায় আমি এই শব্দগুলো কিছু বাধ্যবাধকতার কারণে ব্যবহার করেছি, কিন্তু তোমাদেরকে নম্রতা অবলম্বন করতে হবে, তোমাদের কঠোর শব্দ ব্যবহার করলে চলবে না। আর তিনি এই কঠোরতায় তাদের ইতিহাসের বরাত দিয়ে কথা বলেছেন, তাদের মতো গালিগালাজ এবং নোংরা ভাষা ব্যবহার করেন নি।

অনুরূপভাবে এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, আমাদের জন্য পবিত্র কুরআনে নির্দেশ হলো, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (সূরা আনকাবুত: ৪৭)। এটি সূরা আনকাবুতের আয়াত। এর অর্থ হলো, উত্তম পন্থা ব্যতিরেকে আহলে কিতাবের সাথে বিতর্ক করো না। এছাড়া অন্যত্র তিনি বলেন, এটাও আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ যে, ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (সূরা আন-নাহল: ১২৬)। এর অর্থ হলো, উত্তমভাবে এবং এমন পদ্ধতিতে খ্রিষ্টানদের সাথে বিতর্ক করা উচিত যা কল্যাণকর। প্রজ্ঞাপূর্ণ পদ্ধতি এবং এমন হিতাকাঙ্ক্ষামূলক রীতি অবলম্বন করা উচিত যেন তাদের উপকার হয়। আর এই নীতিই প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের ক্ষেত্রে তবলীগকারী বা প্রচারকারীর জন্য প্রযোজ্য, তা সে ইহুদী হোক, খ্রিষ্টান হোক, হিন্দু হোক অথবা আজকাল মুসলমানদের মধ্য থেকে যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মুসলমান মনে করে না– তাদেরকে তবলীগের জন্যও এই একই উপদেশ প্রজোয্য। তিনি বলেন, আমরা সরকারের সাহায্য নিয়ে কিছু করব অথবা নাউযুবিল্লাহ্ নিজেরাই উত্তেজনা প্রদর্শন করব– এটা ভুল পদ্ধতি, যা আমাদের মূল উদ্দেশ্য অর্জনে মোটেও উপকারী নয়। এগুলো পার্থিব ঝগড়াবিবাদের দৃষ্টান্ত এবং প্রকৃত মুসলমান ও ইসলামী রীতিনীতি সম্পর্কে অবহিত লোকেরা কখনোই এগুলো পছন্দ করেন না; কারণ এর দ্বারা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য উপকারী ফলাফল সৃষ্টি হতে পারে না।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ও তফসীরে কবীরে ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ-এর ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি অভিধানের দিক থেকে হিকমত বা প্রজ্ঞার অর্থ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হিকমতের অর্থ 'হিলম' বা নম্রতাও হয় এবং এর মানে হলো, নম্রতার সাথে এবং বিবেকবুদ্ধি খাটিয়ে কথা বলা। আল্লাহ্ তা'লা একথা বলেছেন কারণ যে ব্যক্তি এমনটা করে না, সে দ্রুত উত্তেজিত হয়ে রাগান্বিত ও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে, ফলে সে অন্যকে কখনোই বোঝাতে পারে না। একইভাবে হিকমতের একটি অর্থ নবুওয়ত, আর এ অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে এর অর্থ হবে– আল্লাহ্‌র কালাম বা ঐশীবাণীর সাহায্যে মানুষকে ধর্মের দিকে আহ্বান করো। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা যে কালাম দিয়েছেন এবং পবিত্র কুরআন নিজে যেসব দলিল উপস্থাপন করেছে সেগুলোই উপস্থাপন করো, নিজের পক্ষ থেকে মনগড়া কথা উপস্থাপন কোরো না। তিনি বড়ো আক্ষেপের সাথে বলেছিলেন, মুসলমানরা যদি এই রহস্য বুঝত তবে তারা ইহুদী ও খ্রিষ্টান ধর্মকে গ্রাস করে ফেলত (পরাজিত করত)। আমাদের হাতিয়ার হলো পবিত্র কুরআন, যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন: وَجَاهِدْهُم بِهِ– এই কুরআনের তরবারি নিয়ে দুনিয়ার সাথে জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়ো। কিন্তু পরিতাপ, আজ জাগতিক সবকিছু মুসলমানদের হাতে রয়েছে, অর্থাৎ যারা ধনী দেশ– তাদের; কিন্তু যদি কিছু না থাকে তবে তা হলো সেই তরবারি যা নিয়ে বেরিয়ে পড়ার আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দিয়েছিলেন। অর্থাৎ তবলীগের জন্য পবিত্র কুরআনের দলিল নিয়ে বের হও। তেলের সম্পদ আছে, অনেক ব্যাবসাবাণিজ্য আছে, মুসলমানদের অনেক দেশ রয়েছে। মুসলমানদের চুয়ান্নটি দেশ আছে, কিন্তু ইসলামী শিক্ষায় সজ্জিত হয়ে যেভাবে জিহাদ করা উচিত ছিল, তারা সেভাবে করে নি। তারপর তিনি

অভিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে বলেন, হিকমতের একটি অর্থ হলো এমন কথা বলা যা মূর্খতা থেকে বিরত রাখে। এখন এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে, তোমরা এমন পদ্ধতিতে কথা বলো যা অন্যজন বুঝতে পারে এবং যার মাধ্যমে তার ভুল ধারণা দূর হতে পারে। অর্থাৎ এমন কথা হওয়া উচিত যা মূর্খতার মূলোৎপাটন করে এবং সম্বোধিত ব্যক্তির জ্ঞানবুদ্ধিসম্মত হয়। যেমন হাদীসেও এসেছে: أُمِرْنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نُكَلِّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ অর্থাৎ মহানবী (সা.) আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যেন আমরা মানুষের সাথে তাদের বোধবুদ্ধি ও জ্ঞান অনুসারে কথা বলি। যেমনটি আমি পূর্বেও হাদীসের উল্লেখ করেছি। কিছু লোক বক্তৃতা দেবার সময় কঠিন কঠিন শব্দ ও পরিভাষা ব্যবহার করে প্রতাপান্বিত করতে চায়। এসব বক্তৃতার মাধ্যমে হয়ত মূর্খদের ওপর প্রভাব পড়ে ঠিকই, কিন্তু এসব বক্তৃতার দ্বারা কেউ লাভবান হয় না। এখন এখানেও এমনটিই হয়। আমরা যখন অন্যদের সাথে বা কখনো আলেমদের সাথে কথা বলি, তারাও এই ধরনের কথা বলতে থাকে; কিন্তু যদি আমরাও সেভাবেই কথা বলি– তবে তাদের লাভ হবে কি না জানি না, কিন্তু সাধারণ মানুষ আসল বিষয়টি বুঝতে পারে না। তারা কেবল বাগাড়ম্বরের আবর্তে পড়ে থাকে। যখন সহজ ভাষায় বোঝাবেন তখন হতে পারে শ্রোতাদের মধ্যে এমন অনেক লোক থাকবে যারা সহজ ভাষায় কথাটি বুঝতে পারবে এবং তারা ঐ বাগাড়ম্বরদের পরিবর্তে আপনার কথা শুনে তাতে বেশি মনোযোগ দিতে চাইবে। এরপর তিনি বলেন, সত্যসম্মত কথাকেও হিকমত বা প্রজ্ঞা বলে। এটিও অভিধানে লেখা আছে। এই অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতের অর্থ হবে, এমন কথা বলো যা সত্য এবং বাস্তবসম্মত। কিছু লোক সত্য ধর্মের দিকেই ডাকতে গিয়ে কিছু ভুল কথাও বলে ফেলে। অনেক সময় মানুষের দ্বারা তবলীগে অতিরঞ্জন হয়ে যায়, অথচ তবলীগে কোনো অতিরঞ্জনের প্রয়োজন নেই। পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে সামনে রাখুন, হাদীস সামনে রাখুন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী সামনে রাখুন এবং তবলীগ করুন, আর তারপর বিষয়টি আল্লাহ্‌র ওপর ছেড়ে দিন। তিনি বলেন, ভুল কথা বর্ণনা করার এই পদ্ধতিটিই ভুল। শত্রুর মোকাবেলায় যা বলবে সত্য বলবে। অন্যদের হিদায়াত দিতে দিতে নিজেই পথভ্রষ্ট হয়ে যেও না। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন: لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ অর্থাৎ, যদি তোমরা হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো তবে এর পরোয়া কোরো না যে, অন্য কেউ পথভ্রষ্ট হচ্ছে কি না। অন্যের পথভ্রষ্টতা তোমাদের কোনো ক্ষতি করবে না। নিজেকে রক্ষা করো। অর্থাৎ এমন কোনো কাজ যা পাপ বা ভুল– তা এই ভেবে কোরো না যে, এর মাধ্যমে আমি অন্যকে সৎপথ দেখাবো। যখন তোমার নিজের হিদায়াত এবং অন্যকে হিদায়াত দেবার বিষয়টির সংঘর্ষ হয় তখন তুমি তোমার নিজের হিদায়াতের কথা চিন্তা করো এবং অন্যের হিদায়াত আল্লাহ্‌র ওপর ছেড়ে দাও। কারণ আল্লাহ্ তা'লা চান না যে, কোনো মু'মিন কাফির হয়ে যাক এবং কোনো কাফির মু'মিন হয়ে যাক। তিনি তো অন্যদেরকে সৎপথ দেখাতে চান।

এরপর তিনি এই 'হিকমত' শব্দটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অভিধানের সূত্র ধরে এ-ও বলেছেন যে, স্থানকাল অনুযায়ী যথাযথ কথা বলাকেও 'হিকমত' বলে। এই অর্থের ভিত্তিতে আয়াতটির অর্থ হবে, তবলীগের সময় অবস্থানুযায়ী কথা বলা উচিত। যদি কোনো যুক্তির কারণে শত্রুর উত্তেজিত হবার ও রাগান্বিত হবার আশঙ্কা থাকে আর এই ভয় থাকে যে, সে এভাবে তোমার কথা শুনবে না– তবে অকারণে তাকে খেপানো উচিত নয়। তুমি তার সামনে অন্য যুক্তিগুলো তুলে ধরো, যা সে শান্ত মনে শুনতে পারে। অর্থাৎ কথা বলার সময় প্রথমে মানুষের মেজাজমর্জি বুঝে নাও। তুমি যদি অকারণে তাদেরকে উত্তেজিত করো, তবে এমন

তবলীগের ফলে কোনো লাভ হবে না। শুধুমাত্র নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার জন্য এবং এটা বলার জন্য যে, আমরা সত্য, মসীহ্ মওউদ সত্য, ইসলাম সত্য আর নিঃসন্দেহে হযরত মুহাম্মদ (সা.) সমস্ত পৃথিবীর জন্য নবী– এই কথাগুলো যদি প্রমাণ ছাড়া বলো, তবে কেবল উত্তেজনা সৃষ্টি হবে। প্রজ্ঞার সাথে কথা বলো, যেন মানুষ একথাগুলো বুঝতে পারে।

সুতরাং এটাই সৌন্দর্য , সংক্ষিপ্ত শব্দের মাঝে আল্লাহ্ তা'লা তবলীগের সমস্ত মূলনীতি বর্ণনা করে দিয়েছেন। আর এটাই সেই পদ্ধতি যার ওপর আমরা তবলীগকারীরা আমল করলে ইনশাআল্লাহ্ সফলতাও পাবো। **الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ** অর্থ হলো সেই কথা যা অন্তরকে নরম করে এবং হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলে। এই উপদেশের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে এ দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যে, শুধুমাত্র কাঠখোট্টা যুক্তি দিয়ে কাজ চালিয়ে যেও না। বর্তমানে আহমদীয়া জামা'তের দায়িত্ব হলো, ইসলামের এই বার্তা বিশ্বকে জানানো। বিরোধী বা প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে যাদের সাথেই কথা হয়, তাদের প্রত্যেককে এটা বলা উচিত যে, ধর্মে কেবল নিরস যুক্তিনির্ভর নয়, বরং উপদেশের বিভিন্ন দিক রয়েছে যা মেনে চলা উচিত। এরপর তিনি (আ.) বলেন, আবেগ জাগানিয়া কথাবার্তাও বলো এবং হিকমতের পাশাপাশি **الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ**-কেও দৃষ্টিপটে রাখো। আর 'হাসানা' শব্দটি ব্যবহার করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, মিথ্যা আত্মসম্মানবোধে সুড়সুড়ি দেবে না, যেভাবে বর্তমানকালের মূর্খ আলেমরা অকারণে মানুষকে সত্য ও সততার বিরুদ্ধে উসকে দেয়। **وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ** (অর্থাৎ আর তাদের সাথে এমনভাবে বিতর্ক করো যা সবচেয়ে উত্তম)– বলে বোঝানো হয়েছে যে, তাদের সাথে তর্ক করার সময় অর্থাৎ আলোচনার সময় বিভিন্ন যুক্তির মধ্যে যেটি সবচেয়ে উত্তম এবং শক্তিশালী যুক্তি, সেটিকে ভিত্তি ও কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে উপস্থাপন করো এবং বাকি যুক্তিগুলোকে এর অধীন রাখো, কেননা সহায়ক যুক্তি খণ্ডিত হলেও মূল যুক্তিতে কোনো আঁচড় পড়ে না। এর বিপরীতে যদি মূল বিষয়টি দুর্বল হয়, তবে শক্তিশালী সহায়ক যুক্তিও কোনো কাজে আসে না।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন: **إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ** (সূরা আন-নাহল: ১২৬) নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক-প্রভুই তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত ব্যক্তিকে সবচেয়ে বেশি জানেন এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদেরও তিনিই সবচেয়ে বেশি জানেন। সুতরাং এখানে বলা হয়েছে যে, তোমরা ভালোভাবে তবলীগ করতে থাকো, কিন্তু যদি মানুষ গ্রহণ না করে, তবে এর এই অর্থ করে হতাশ হয়ে যেও না যে, আমরা তবলীগ করতেই জানি না। কেননা, হতে পারে তোমাদের প্রচারে কোনো ত্রুটি নেই, কিন্তু সম্বোধনকৃত ব্যক্তির হৃদয়ে তার পাপের এমন মরিচা জমে আছে যে, আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য হিদায়াতের জানালা খুলছেন না। মোটকথা, তবলীগের কাজে মগ্ন থাকা উচিত। এটাই মূল বিষয়। আমাদের কাজ হলো প্রচার চালিয়ে যাওয়া। ফলাফল প্রকাশ করা এবং প্রভাব সৃষ্টি করা আল্লাহ্ তা'লার কাজ।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, অনেকেই মৌলবী ও আলেম হবার দাবি নিয়ে মিম্বরে চড়ে, নায়েবে রসূল এবং নবীদের উত্তরাধিকারী হবার দাবি করে ওয়ায করে বেড়ায়। তারা মুখে বলে, অহংকার, দাম্ভিকতা এবং পাপাচার থেকে বেঁচে চলো। কিন্তু তাদের নিজেদের কর্মকাণ্ড ও আচরণ– যাতে তারা লিপ্ত, তা এ বিষয় থেকেই বুঝা যায় যে, তাদের কথাবার্তার ফলে তোমাদের হৃদয় কতটা প্রভাবিত হয়! সৎ প্রকৃতির ব্যক্তিদের ওপর তাদের প্রভাব কতটুকু! অতএব এই মৌলবীদের তবলীগের প্রভাব যদি তোমাদের ওপর না পড়ে তাহলে নিজেদের অবস্থা চিন্তা করে দেখো। তোমরাও যদি একই কথা বলো, তবে তোমাদের

কথার কী-ইবা প্রভাব পড়বে! এ থেকে উপলব্ধি করো যে, তোমরা যদি তবলীগ করে থাকো তাহলে সর্বপ্রথম নিজেদের আমল ঠিক করা উচিত এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলা আবশ্যক। এমনটি যদি হয় তবেই তোমাদের তবলীগ সঠিক, সফল এবং ফলপ্রসূ হবে। তিনি (আ.) বলেন, এসব লোক যদি কর্মশক্তিতে বলিয়ান হতো এবং বলার পূর্বে নিজে করে দেখাতো, তাহলে পবিত্র কুরআনে لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ (সূরা সাফ: ০৩) (অর্থাৎ তোমরা এমন কথা কেন বলো যা নিজে করো না?)– বলার কী প্রয়োজন ছিল? আল্লাহ্ তা'লার কী প্রয়োজন ছিল পবিত্র কুরআনে لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ বলার? এ আয়াতই প্রমাণ করছে যে, উপদেশ দিয়ে নিজে আমল না করার দলের মানুষ পৃথিবীতে পূর্বেও ছিল, এখনো আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। সুতরাং এটি এ বিষয়ের প্রমাণ যে, এমন লোক সর্বদাই থাকবে যারা তবলীগ করে এবং তাদের দলিলপ্রমাণ শুনে মানুষ কখনো কখনো প্রভাবিত হয় ঠিকই, কিন্তু যখন তাদের ব্যবহারিক আচরণ দেখে তখন দূরে সরে পড়ে। তাই তোমরা যদি তবলীগ করতে চাও তাহলে তোমাদের কথা এবং কাজে মিল রাখো। তবেই তোমাদের তবলীগ সফল হবে এবং তাতে কল্যাণও লাভ হবে।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, তোমরা আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং ভালোভাবে স্মরণ রাখো, মানুষের কথাবার্তা যদি হৃদয় থেকে উৎসারিত না হয় এবং তা যদি কর্মবলে সজ্জিত না হয় , তবে তা প্রভাববিস্তারী হয় না। এ কারণেই তো আমাদের মহানবী (সা.)-এর মহান সত্যতা প্রতিভাত হয়, কেননা যে পরিমাণ সফলতা এবং (মানুষের) হৃদয়ে যতটা প্রভাব বিস্তারে তিনি সক্ষম হয়েছেন, অর্থাৎ যেভাবে তিনি সফল্য লাভ করেছেন আর মানব হৃদয়ে যেভাবে প্রভাব বিস্তার করেছেন– এর কোনো দৃষ্টান্ত মানবেতিহাসে পাওয়া ভার। আর এ সবকিছু হবার কারণ হলো, তিনি (সা.) কথা ও কাজে এক ও অভিন্ন ছিলেন।

অতএব আমরা যদি তবলীগের কাজ করতে চাই এবং সংবাদ পৌঁছাতে চাই, তাহলে আমাদের এই পদ্ধতির ওপর আমল করতে হবে। মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা মেনে চলতে হবে এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অপর একস্থানে বলেন,

মু'মিনের দ্বিমুখী আচরণ করা উচিত নয়। সর্বদা নিজেদের কথা এবং কাজকে ঠিক রাখো এবং এর মাঝে সমতা বজায় রাখো। যেভাবে সাহাবীরা নিজ জীবনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দেখিয়েছেন, তেমনিভাবে তোমরাও তাঁদের (রা.) পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেদের সত্যনিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার নমুনা উপস্থাপন করো। কেবল তবেই তোমাদের তবলীগ বরকতমণ্ডিত হবে। শুধুমাত্র এটি মনে করা যে, আমাদের কাছে মিডিয়া সহজলভ্য হয়ে গেছে, আমরা (এর মাধ্যমে) তবলীগ করব– এভাবে তো তবলীগের ফলাফল সৃষ্টি হতে পারে না।

এরপর وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) একস্থানে এভাবে বলেন, যাকে উপদেশ দিতে হবে তাকে মৌখিকভাবে উপদেশ দাও। অর্থাৎ কথার মাধ্যমে উপদেশ দিতে হবে। একই কথা একভাবে উপস্থাপন করা কোনো ব্যক্তিকে শত্রু বানিয়ে দিতে পারে, আবার ভিন্নভাবে উপস্থাপন তাকে বন্ধু বানাতে পারে। শব্দ তো একই, একই কথা বলাটাই উদ্দেশ্য; কিন্তু সেটিই এক আঙ্গিকে বললে মানুষ শত্রু হয়ে যায়, আর কোমল ভাষায় যদি বলা হয় তাহলে মানুষকে বন্ধু বানিয়ে দেয়। অতএব নিজেদের কাজ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ নির্দেশ অনুসারে করো। এই পদ্ধতিতে কথা বলাকেই আল্লাহ্ তা'লা 'হিকমত' নামে অভিহিত করেছেন। এজন্যই তিনি বলেছেন, يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ (আল-বাকারা: ২৭০) অর্থাৎ তিনি

যাকে ইচ্ছা প্রজ্ঞা দান করেন। এরপর তিনি (আ.) বলেন, ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যতা প্রকাশের জন্য সর্বপ্রথম দিক হলো, তোমরা আদর্শ মুসলমান হয়ে যাও।

অতএব এটিই হলো সর্বপ্রথম বিষয়। এটি কোনো কৃতিত্ব নয় যে, আমরা তবলীগ করেছি অথবা আমরা তাদের কাছে বার্তা পৌঁছিয়েছি। বার্তা পৌঁছানোর পাশাপাশি আমাদের এটিও দেখতে হবে যে, আমরা আমাদের মাঝে কী পরিবর্তন সাধন করেছি। শুধুমাত্র সংবাদ পৌঁছানোই যথেষ্ট নয়। এতটুকু নিয়েই গর্ব করা উচিত নয় যে, আমরা আহমদী হয়েছি, আমরা তবলীগ করেছি এবং দাঈ ইলাল্লাহ্ তালিকায় আমাদের নাম উঠেছে। না, বরং তিনি (আ.) বলেন, সর্বপ্রথম দিক হলো, তোমরা আদর্শ মুসলমান হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করো। আর দ্বিতীয় দিক হলো, এর অনন্য বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি পৃথিবীতে বিস্তৃত করো। হ্যাঁ, এরপর (তোমরা) যখন উত্তম আদর্শে পরিণত হবে, অতঃপর পৃথিবীতে প্রচার করবে– তখনই দেখো, কী বিপ্লব সাধিত হয়! যে বিপ্লব পৃথিবীতে সম্পদশালীরা সৃষ্টি করতে পারে নি, তা তোমরা সৃষ্টি করবে। যারা কয়েক দিন তবলীগ করে মনে করেন যে, কোনো ফল আসলো না– তাদের সম্পর্কেও তিনি (আ.) বলেন,

কথা বলার সময় ভেবেচিন্তে এবং সংক্ষিপ্তাকারে কাজের কথা বলা উচিত। দীর্ঘ বিতর্ক করে কোনো লাভ নাই। কখনো কখনো সুযোগে ছোট্ট কোনো একটি বাক্য বলবে যা সরাসরি হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করবে। পরে আবার সুযোগ পেলে বলো। [এটি অবিচল মনোভাব নিয়ে তবলীগ করার বিষয়।] **মোটকথা, ধীরে ধীরে সত্যের বার্তা পৌঁছানো অব্যাহত রাখতে হবে; ক্লান্ত যেন না হয়।** [এটি আমাদের কাজ, ক্লান্ত হলে চলবে না। এমন নয় যে, আমরা একদিন ক্যাম্প বা স্টল দিলাম এবং তবলীগ করলাম আর এরপর কাজ শেষ হয়ে গেল।] **না, কেননা বর্তমানে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করাকে লোকজন পাগলামি মনে করে। তিনি (আ.) বলেন, বর্তমানে আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক গড়াকে পাগলামি মনে করা হয়। সাহাবীরা যদি বর্তমান যুগে থাকতেন তবে লোকেরা তাদেরকে উন্মাদ বলত এবং তারা তাদেরকে কাফির বলত। দিবানিশি অনর্থক বিষয়াবলি, বিভিন্ন প্রকার শৈথিল্য প্রদর্শন এবং পার্থিব ভাবনায় মগ্ন থাকার ফলে হৃদয় কঠিন হয়ে যায় এবং কথার প্রভাব বিলম্বে পড়ে।** আজকাল তো পৃথিবীতে আরো বেশি জগৎপূজারি মানুষ রয়েছে। তিনি (আ.) যে যুগে একথা বলেছিলেন সে যুগের তুলনায় বর্তমানে বস্তুবাদিতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। পার্থিবতায় নিমজ্জিত আছে। তাদের ওপর কী-ইবা প্রভাব পড়বে! তাই এটি মনে করবেন না যে, আমরা অমুক মৌলবী বা অমুক আলেমকে তবলীগ করে তাকে মান্য করাবো অথবা অমুক বিতার্কিককে বা আপত্তিকারীকে তবলীগ করব। আমাদের উদ্দেশ্য হলো, পৃথিবীতে ইসলামের প্রকৃত বার্তা পৌঁছানো এবং পৃথিবীকে একথা মানানো হলো যে, এই যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের কথা ছিল এবং তিনি এসে গেছেন। এজন্য আমাদের চেষ্টাপ্রচেষ্টা করা উচিত। শুধুমাত্র বিতর্ক আর দীর্ঘ প্রশ্নোত্তরে লিপ্ত হবার পরিবর্তে এটি দৃষ্টিপটে রাখুন যে, তবলীগের মাধ্যমে আমরা কীভাবে বেশি বেশি মানুষের কাছে সত্যের বার্তা পৌঁছাতে পারব এবং তাদের সংশোধন করতে পারব। সাহাবীরাও এটি করেছিলেন। তারা তবলীগ করতেন, কিন্তু বর্তমানে যেহেতু মানুষ পার্থিব চিন্তাভাবনায় নিমজ্জিত আছে এবং তাদেরকে বোঝানো বড়োই কষ্টসাধ্য, তাই অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে তাদেরকে বোঝাতে হয়। আবার একই কথা বলা হচ্ছে যে, যদি আমাদের ব্যবহারিক কর্মকাণ্ড আদর্শিক হয় তবে লোকদের দৃষ্টিও স্বাভাবিকভাবে আমাদের দিকে আকৃষ্ট হবে।

তিনি (আ.) নিজের একটি উদাহরণ উপস্থাপন করেন যে, এক তহশিলদার ছিল। সে আমার সাথে বাহাস করত। আমি তাকে নসীহত করতাম। সে আমাকে উপহাস করত। আমিও তাকে পরিত্যাগ করি নি। আমি বলি, তোমাকে ছাড়ব না। তোমাকে বলতেই থাকব, উপদেশ দিতই থাকব। হয়ত তিনি (আ.) তার মাঝে কোনো পুণ্য স্বভাব দেখে থাকবেন। যাহোক তাকে অবিচলতার সাথে বুঝাতে থাকি। অবশেষে এমন এক সময় উপস্থিত হলো যে, সে হাউমাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করে এবং আমার কাছে ক্ষমা চাইতে থকে। [একটি সময় এমন ছিল যখন হাসি, ঠাট্টাবিদ্রুপ করত, আর পরবর্তীতে কান্নায় ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়; এমনকি কান্না শুরু করে দেয়।] অতএব তিনি (আ.) বলেন, অনেক সময় পুণ্যবানকেও দুর্ভাগা ও অভাগা মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে পুণ্যবানই হয়ে থাকে। তার পেছনে লেগে থেকে তার বোধশক্তি অনুযায়ী এবং প্রজ্ঞার সাথে কথা বলতে থাকলে একসময় সে বুঝতে সক্ষম হয়। তিনি (আ.) বলেন, স্মরণ রাখবে, প্রত্যেক তালার একটি নির্দিষ্ট চাবি রয়েছে। [অর্থাৎ প্রত্যেকটি তালা খোলার জন্য একটি চাবি থাকে।] কথা বলার ক্ষেত্রেও একটি চাবি রয়েছে, আর সেটি হলো– সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন। [সঠিক পদ্ধতিতে কথা বলা উচিত।] তিনি (আ.) বলেন, যেভাবে অনেক ওষুধের মধ্যে একটি ওষুধ একজনের জন্য কার্যকরী হয়ে থাকে এবং অপরজনের জন্য ভিন্ন ঔষধ কার্যকরী সাব্যস্ত হয়ে থাকে, তদ্রূপ প্রত্যেকটি কথা কোনো বিশেষ ভঙ্গিতে বা শৈলিতে কোনো ব্যক্তিবিশেষের জন্য কার্যকরী সাব্যস্ত হতে পারে। এমন যেন না হয় যে, সবার সাথে একই ধাঁচে কথা বলবে। তবলীগকারীর উচিত, কারো মন্দ কথায় যেন উত্তেজিত না হয়, বরং নিজের কাজ যেন অব্যাহত রাখে এবং ক্লান্ত না হয়। ধনী ব্যক্তিদের প্রকৃতি অত্যন্ত স্পর্শকাতর হয়ে থাকে আর তারা জগৎ সম্পর্কে উদাসীন হয়ে থাকে। অনেক কথা তারা সহ্য করতে পারে না। তাদেরকে বিশেষ কোনো সময়ে বিশেষ ধাঁচে এবং অত্যন্ত বিনম্রভাবে উপদেশ প্রদান করা উচিত। সকল শ্রেণির মানুষকে উপদেশ প্রদান করতে হবে; ধনীদেরকেও এবং দরিদ্রদেরকেও। ধনী ব্যক্তিদেরকে তবলীগ করার কৌশল সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদেরকে নসীহত করবে। তিনি (আ.) এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আরাবী (রহ.)-র উদাহরণ দিয়েছেন যে, ইবনে আরাবী লিখেছেন, আল্লাহ্ তা'লা হযরত মূসা (আ.)-কে ফেরাউনের প্রতি বিনম্র আচরণ করার নির্দেশ কেন দিয়েছিলেন? এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব হলো, আল্লাহ্ তা'লা অবগত ছিলেন– পরিশেষে সে ঈমান আনার সৌভাগ্য লাভ করবে। তিনি (ইবনে আরাবী) লেখেন, **'আমানতু'** শব্দ তার মুখ থেকেই উচ্চারিত হয়েছে। অবশেষে যখন সে মৃত্যুর মুখে নিপতিত হচ্ছিল এবং নিমজ্জিত হচ্ছিল তখন সেই এই শব্দই উচ্চারিণ করেছিল যে, **'আমানতু'** (অর্থাৎ আমি ঈমান আনছি)।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তবলীগের পদ্ধতি সম্পর্কে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-কে যখন কারাগারে প্রেরণ করা হয় তখন সেখানে আরো দুইজন কয়েদি ছিল। এ বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (রা.) লেখেন, হযরত ইউসুফ (আ.) নিজের দিকে তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য এক অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করেন। যেহেতু এই আশঙ্কা ছিল যে, তবলীগ করলে তারা অধৈর্য হয়ে পড়বে, এ কারণে প্রথমে তাদেরকে এই নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, আমি (তোমাদের কাছ থেকে) বেশি সময় নেব না, বরং খাবার আসার পূর্বেই তোমাদের ছেড়ে দেবো। এমনটি করার কারণ হলো, তারা যেন অধৈর্য না হয় এবং মনোযোগ সহকারে কথা শোনে। সম্ভবত হযরত ইউসুফ (আ.) তবলীগ করার সুযোগ পেতেন না। তাই তিনি তাদের প্রশ্নকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করেন। [অর্থাৎ বন্দিরা যে স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল।] আর তিনি (আ.) ভেবেছিলেন

যে, তাদের চাহিদা পূর্ণ করার পূর্বেই তাদেরকে তবলীগ করব, তাহলে তারা শুনতে বাধ্য হবে। অতঃপর তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর উদাহরণ দেন। [শুধু হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দৃষ্টান্ত নয়। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর একটি দৃষ্টান্ত তো দিয়েছেন, আর অপরটি ছিল মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টান্ত।] প্রাথমিক যুগে মহানবী (সা.) যখন নিজ দাবি উপস্থাপন করেন আর তিনি (সা.) যখন মক্কার অধিবাসীদেরকে তবলীগ করতে চাইতেন, তখন তারা উপেক্ষা করে চলে যেত এবং তবলীগ (বিষয়ক কথা) শুনত না। অবশেষে তিনি (সা.) একটি নিমন্ত্রণের আয়োজন করেন এবং খাবারদাবার খাইয়ে তবলীগ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু (খাওয়া শেষে) তারা উঠে চলে যায়। এতে তিনি (সা.) এই উপায় অবলম্বন করলেন যে, পুনরায় তাদেরকে দাওয়াত দিলেন এবং খাবার আসার পূর্বে তাদেরকে নিজের দাবি সম্পর্কে অবগত করলেন। তারা খাবারের অপেক্ষায় সেখানে বসে থাকতে বাধ্য ছিল, এ কারণে তিনি (সা.) তাদেরকে কথা শোনানোর সুযোগ পেয়ে যান। উপরোক্ত আয়াত থেকে নবীদের উপদেশ প্রদানের পদ্ধতিও জানা যায়। সুতরাং তাদের অনুসরণে ওয়ায-নসীহত করার সময় সদা স্মরণ রাখা উচিত, কথাও যেন বলা হয়, আবার সে কথা যেন অন্যদের জন্য কষ্টের কারণও না হয়। অর্থাৎ একটি নীতিগত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, এমনভাবে কথা বলবে যা সঠিকও হবে, কিন্তু এমনভাবে বলবে যেন অন্যের জন্য তা কষ্টকর না হয়। অতএব প্রজ্ঞার সাথে কথা বলা উচিত আর এ বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখা উচিত যে, এমন একটি যুগে– যখন ইউরোপের লোকদের ইসলাম গ্রহণের কোনো ধারণাই করা যেত না– সেই যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইংরেজীতে নিজ প্রবন্ধ অনুবাদ করিয়ে ইউরোপে বিতরণ করিয়েছেন। আর আল্লাহ্ তা'লা যখন তাঁকে এক জামা'ত দান করেন, তখন তিনি (আ.) তাদেরকে উপদেশ প্রদান করে বলেন, জিহাদ হলো ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা এক মুহূর্তের জন্যও পরিত্যাগ করা যায় না। যেভাবে নামায, রোযা, হজ্জ এবং যাকাত ইসলামের এমন গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেগুলোর ওপর আমল করা প্রত্যেক যুগে আবশ্যক, তেমনিভাবে জিহাদও এমন এক গুরুত্বপূর্ণ আমল যার ওপর সর্বযুগে আমল করা আবশ্যক। অতএব এ যুগে জিহাদ করার পদ্ধতি কী? আমাদের ওপর অভিযোগ আরোপ করা হয় যে, আমরা নাকি জিহাদ করি না। আমরা অবশ্যই জিহাদ করি, কিন্তু (জিহাদের) পদ্ধতি বদলে গেছে। এ বিষয়টি নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হয়। অআহমদী মুসলমানরা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আরোপ করে বলে, আমরা নাকি জিহাদ করি না! আমরা নাকি জিহাদের অস্বীকারকারী! অথচ আমরা যা করছি তা জিহাদই বটে, অর্থাৎ তবলীগের মাধ্যমে লোকদের মাঝে বাণী পৌঁছে দিচ্ছি, পৃথিবীময় ইসলাম ও আহমদীয়াতের প্রচার করছি আর আহমদীয়াতের মাধ্যমে লোকদেরকে ইসলামের সঠিক শিক্ষা সম্বন্ধে অবগত করছি। আফ্রিকা, ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা, (উত্তর) আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, দ্বীপপুঞ্জ– সর্বত্র আমাদের মিশন বিদ্যমান। এতসব কর্মযজ্ঞ কেন করা হচ্ছে? এ হলো সেই জিহাদ যাতে আমরা রত রয়েছি। তাই এ কথা বলা নিতান্ত ভুল যে, আমরা জিহাদে বিশ্বাসী নই। তবে হ্যাঁ, আমি পূর্বেও বলেছি, জিহাদের পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তোমাদের এ যুগের জিহাদ হলো কলমের মাধ্যমে জিহাদ। তোমাদের কলমের ফলা বা নিব– সেটি মূলত তরবারিরই ফলা। তাই এর মাধ্যমে তোমরা জিহাদ করো। এটি ধর্মের প্রচার করার যুগ। তাই এভাবে কলমের মাধ্যমে জিহাদ করো।

অতএব এ বিষয়টি সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা উচিত এবং জগতকে বলা উচিত, তোমরা আমাদের সাথে কী বিতর্ক করছ? (তোমরা বলতে চাচ্ছ−) ইনি মসীহ্ মওউদ নন; মসীহ্ তো জীবিতাবস্থায় (আকাশে) রয়েছেন; মসীহ্ মওউদ তো এভাবে আসার কথা না। এগুলো সবই ভুল। তাদেরকে সঠিকভাবে বুঝাতে হবে যে, কুরআন ও হাদীস (এ বিষয়ে) কী বলে? একদিকে তারা বিশ্বাস করে যে, মসীহ্ এবং মাহদী আসবেন, অন্যদিকে তাঁকে অস্বীকারও করে। আমরা যদি তাদের সাথে আভিধানিক অর্থ ইত্যাদি নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়ি তবে এতে কোনো লাভ হবে না। তাদেরকে বলা উচিত− আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো, ইসলামকে পৃথিবীময় বিজয়ী করা, কেননা মহানবী (সা.) সমস্ত পৃথিবীর জন্য নবী ও রসূল হিসেবে আগমন করেছিলেন। আজ আমরা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশের চেয়েও কম। আমরা যতদিন জগতকে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত করতে সক্ষম না হবো, ততদিন আমরা কীভাবে একথা বলতে পারি যে, আমরা তো অনেক কাজ করে ফেলেছি! আজ এভাবে জিহাদ করার দায়িত্ব আমাদের স্কন্ধে অর্পিত। এটি করলেই আমাদের জিহাদ সফল হবে। অন্যথায় অপরাপর মুসলমানরা যে জিহাদ করতে চায়− সেটি কি কোনো ফলপ্রসূ জিহাদ? ঐ জিহাদে কি কোনো উত্তম ফলাফল লাভ হচ্ছে? কোনো লাভ হচ্ছে না। অতএব প্রত্যেক আহমদীকে এই জিহাদই করতে হবে− যে জিহাদ করতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন। তরবারির মাধ্যমে (জিহাদ) নয়, যার ফলে মুসলমানদের কোনো লাভ হচ্ছে না। এর ফলে তো মুসলমানরা সব জায়গায় অপমানিত হচ্ছে। তবে হ্যাঁ, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে, আর এতক্ষণ আমি যেসব কথা বলেছি, সেগুলোর মাধ্যমে করতে হবে। প্রজ্ঞার সাথে তবলীগের পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করুন, আল্লাহ্ তা'লার সাথে দৃঢ় সম্পর্ক সৃষ্টি করুন। জামা'তের মুরব্বীদেরও উচিত, জামা'তের সদস্যদের তরবিয়ত করার মাধ্যমে এমন সেনাদল প্রস্তুত করা যারা এই জিহাদে অংশগ্রহণ করবেন। মুরব্বীদের উদ্দেশ্য বলতে চাই, তাদের ওপর অনেক বড়ো দায়িত্ব অর্পিত। তারা কেবল জামা'তের সদস্যদের তরবিয়ত করলেই চলবে না, বরং তরবিয়তের পাশাপাশি জামা'তের সদস্যদের আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করাতে হবে। এই কাজগুলো করার পাশাপাশি তাদেরকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ করতে হবে এবং তাদেরকে এই জিহাদের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। এ কাজগুলো করতে পারলেই তারা নিজেদের অঙ্গীকার পূর্ণকারী হতে সক্ষম হবে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মুরব্বীদের উপদেশ দিতে গিয়ে একবার বলেছিলেন যে, কীভাবে তবলীগ করা উচিত এবং একজন মুরব্বীর কেমন হওয়া উচিত। বরং দুই-তিনটি উপলক্ষ্যে তিনি মুরব্বীদের এই উপদেশগুলো দিয়েছিলেন, তবে সেগুলো বেশ দীর্ঘ। কখনও যদি সুযোগ হয় তাহলে বর্ণনা করব। এখন আমি সেগুলোর সারসংক্ষেপ বর্ণনা করছি, অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উল্লেখ করছি।

প্রথম কথা হলো, একজন মুরব্বীর মধ্যে 'তাযকিয়ায়ে নাফস' (তথা আত্মশুদ্ধি) থাকা উচিত। সে নিজে আত্মশুদ্ধি করার চেষ্টা করবে এবং এরপর জামা'তের সদস্যদের আত্মশুদ্ধি করানোর চেষ্টা করবে। তার তাহাজ্জুদের অভ্যাস থাকা উচিত, এবং সেইসাথে জামা'তের সদস্যদেরও ইবাদতের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করবে। সে নিজে গভীর অভিনিবেশ সহকারে পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করবে এবং জামা'তের সদস্যদেরকেও অধ্যয়নের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করবে। যদি দাঈয়ানে ইলাল্লাহ্ তৈরি করতে হয় তবে পদ্ধতিটি এমন হওয়া উচিত− মানুষ যেন 'যিকরে ইলাহী'র দিকে নিজেও মনোযোগ দেয় এবং জামা'তের সদস্যদেরও মনোযোগ আকর্ষণ করে। এদিকেও হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মনোযোগ

আকর্ষণ করেছেন যে, ব্যক্তিগত লাইব্রেরিও একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। কেননা এর মাধ্যমে পড়ার আগ্রহ তৈরি হয়। যেভাবে এ যুগে বইপুস্তকের প্রচলন অনেকটা কমে গেছে, কিন্তু আল-ইসলাম ওয়েবসাইটে অনেক বই এবং জামা'তের অনেক সাহিত্য বিদ্যমান। যাদের বই কেনার সামর্থ্য নেই বা যাদের মধ্যে এমন আগ্রহ তৈরি হয় না, তারা যেন অন্তত এদিকে মনোযোগ দেয় এবং অধ্যয়নের জন্য একটি সময় নির্ধারণ করে নেয়। সেইসাথে তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্‌র ওপর ভরসাও অনেক বেশি থাকা উচিত। কারো অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ্ তা'লাকেই প্রতিটি বিষয়ের উৎস মনে করা উচিত, কারণ আল্লাহ্ তা'লার মাধ্যমেই আমরা সবকিছু পেয়ে থাকি। মানুষের সাথে সম্পর্ক উন্নত করা উচিত। আমাদের জনসংযোগও খুবই দুর্বল, যার কারণে তবলীগের গণ্ডি সীমিত হয়ে যায়। আমাদের এই দিকেও মনোযোগ দেওয়া উচিত। খুব কম লোকই আছে যারা সম্পর্ক বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দেয়। আমরা যখন এ বিষয়ে অগ্রসর হবো এবং আমাদের সদস্যদের এগিয়ে নিয়ে যাব, তখন আমাদের তবলীগের ক্ষেত্র আরো সম্প্রসারিত হতে থাকবে।

আবার বীরত্বের সাথে মন্দকে প্রত্যাখ্যান করার সৎসাহসও থাকা উচিত। এটিও খুব বড়ো একটি গুণ যা একজন মুরব্বীর মধ্যে থাকা উচিত এবং এটি জামা'তের মধ্যেও সৃষ্টি করতে হবে। অবিচলতার অভ্যাস থাকা উচিত। আমল এমন হওয়া উচিত নয় যে, চার দিন ভালো কাজ করে নিল, তবলীগের উদ্দীপনা দেখালো বা ইবাদত করে নিল আর তারপর ভুলে গেল; এমনটি হলে চলবে না। বরং একদিকে সে নিজে যেমন এই বিষয়গুলোতে অবিচল থাকবে, তেমনিভাবে জামা'তের মাঝেও এই স্পৃহা তৈরি করবে। যখন মুরব্বীরা নিজেরা এসব বিষয়ে আমল করবে, তখন জামা'তের মধ্যেও নিশ্চিতভাবে এই স্পৃহা তৈরি হবে। তখন এমন দাঈয়ানে ইলাল্লাহ্ তৈরি হবে যারা মানুষের প্রশ্নের সঠিকভাবে উত্তর দিতে সক্ষম হবে এবং তাদেরকে বিব্রত হতে হবে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেমনটি বলেছেন, কেবল ভাষা শিখলেই তবলীগের পদ্ধতি শেখা হয়ে যায় না, বরং মূল বিষয় হলো জ্ঞান। এছাড়া গভীরভাবে চিন্তা করার অভ্যাস থাকা উচিত, আল্লাহ্ তা'লার সাথে নিবিড় সম্পর্ক থাকা উচিত।

এই সমস্ত বিষয় একদিকে যেমন একজন মুরব্বীর মধ্যেও থাকা উচিত, অন্যদিকে জামা'তকে এগুলো শেখানোর চেষ্টা থাকা উচিত। যদি এমনটি হয়, তবে এর মাধ্যমে আমরা এক মহাবিপ্লব সৃষ্টি করতে পারি। তখনই আমরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পতাকাকে পৃথিবীতে উড্ডীন করার যোগ্য হতে পারব আর তখনই আমরা মুসলমানদেরকেও প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং মাহদীর সত্যতা সম্পর্কে অবগত করতে পারব এবং তাদেরকে তাঁর হাতে বয়আত গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাতে পারব।

সুতরাং অনেক দায়িত্ব রয়েছে যেগুলো পালনের দিকে আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং সেগুলো পালন করা প্রয়োজন, আর এক্ষেত্রে আমাদের মুরব্বীদের অনেক বড়ো ভূমিকা পালন করা দরকার। আল্লাহ্ তা'লা সকলকে এর সৌভাগ্য দিন এবং দাঈয়ানে ইলাল্লাহ্‌দেরকেও সৌভাগ্য দিন, তারা যেন সঠিক জ্ঞান লাভ করে, আল্লাহ্ তা'লার সাথে নিবিড় সম্পর্ক তৈরি করে এবং এরপর ইসলাম ও আহমদীয়াতের বার্তাকে বিশ্বের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে দিতে পারে। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)